কল্লোল যুগে নজরুল

'কল্লোল যুগে'র আবির্ভাবের বেশ আগেই নজরুলের কবি প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল বিদ্রোহের জয়-নির্ঘোষে। সাহিত্য যেন নতুন মোড় নিল দ্রোহের চড়াগলার হেসাধ্বনিতে। কবিতা ভাবনায় আচমকা এল নূতন পদচারণা। ভাষা, ছন্দে, প্রতীকী ব্যঞ্জনায় অকথিত ধ্বনি প্রতিধ্বনি।

সে সময় নজরুলকে নিয়ে যাঁরা লিখেছেন, তাঁদের লেখায় যা মুখ্য হয়েছে, তা এই যে, নজরুল এক নূতন ধারার কবি। নিঃসন্দেহে রবীন্দ্র যুগেই নজরুল কাব্য, গল্প এবং সঙ্গীতে এক নূতন ধারার জন্ম দিয়েছেন। 'কলোলল'এর কবিরা এমনটিই চেয়েঠিলেন এবং নজরুলই সর্বপ্রথম তাঁদের সে প্রত্যাশা পূরণ করেছেন।

'কল্লোল যুগে' এটা স্পষ্ট ফুটে উঠেছে যে নজরুল বাংলা সাহিত্যে পালা বদল ঘটিয়েছেন। নজরুল মেধাবী ছাত্র ছিলেন। দারিদ্রের কষাঘাতে তিনি এবং তাঁর পরিবার ছিল জর্জরিত। জীবনকে তিনি তিলে তিলে চিনেছেন। জীবনকে এমন প্রত্যক্ষভাবে দেখা খুব কম কবির ভাগ্যেই হয়েছে। ক্ষুধা মেটাবার জন্য তিনি নানাভাবে জীবিকা অর্জন করতে বাধ্য হয়েছেন। 'চাকর-বাকরের' চাকরীও তাঁকে করতে হয়েছে। লেটো দলে যোগ দিয়ে ফরমায়েশী গান লিখতে হয়েছে। মাইকেল মধুসূদনের দারিদ্র্যের সঙ্গে নজরুলের দারিদ্র তুলনা করা চলে না। তাইতো তাঁর রচিত 'দারিদ্র' কবিতা বাংলা সাহিত্যে বিস্ময় ছড়িয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর এই কবিতাকে 'ইন্টারমিডিয়েট বাংলা টেক্সট বুক' এ অন্তর্ভুক্ত তরে তাঁর প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েছেন।

নজরুল কবিতায় রবীন্দ্রজগত থেকে বেরিয়ে কাব্যের জগতে এক নূতন দ্যোতনা এনেছেন। রবীন্দ্রনাথ জীবনকে যেভাবে দেখছেন, সে ভাবে নজরুল তা দেখেননি। কবিদেরকে 'দ্রষ্টা' বলা হয়। প্রথম দিন যিনি কবিতা লিখেছিলেন তিনিও দ্রষ্টা। কিন্তু একজন আধুনিক কবি একজন মনস্তাত্ত্বিক দ্রষ্টা। জীবনকে তিনি কোন মন নিয়ে দেখলেন সেটিই প্রধান। নিঃসন্দেহে কবিতায় আবেগের প্রবহমানতা থাকবে। ইংরেজীতে একে বলি Emotion। এর সাথে যুক্ত হয় Imagination যা কবিকে একজন দ্রষ্টারূপে পরিগণিত করে। রবীন্দ্রনাথ পৃথিবীকে দ্রষ্টারূপে যেভাবে বুঝেছিলেন, নজরুলে তা ভিন্নরূপ নিয়েছে। রবীন্দ্রনাথেও বিদ্রোহ ছিল। কিন্তু তার পরিব্যাপ্তি ছিল না। নজরুলের বিদ্রোহ কালকে ছাড়িয়ে মহাকালের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। নজরুল জীবনকেই কবিতায় পর্যবসিত করেছিলেন। জীবনের জন্য কবিতা, কবিতার জন্য জীবন

নয়। নজরুলের 'বিদ্রোহ' এবং 'দারিদ্র' পর্যালোচনা করলে তাঁর কাব্যের রূপকল্প আপনিতেই ফুটে ওঠে। একে বুঝতে অপরের সহযোগিতা লাগে না। নজরুল তাঁর কাব্যকলায় ক্লাসিক ও রোমান্টিকের অপূর্ব সমন্বয় সাধন করেছেন। কাব্য রচনায় নজরুলের কোন গুরু ছিল না। একজন 'দ্রষ্টা' নিজেই স্রষ্টায় রূপান্তরিত হন। তাঁর কাব্য এক অসাধারণ দ্বান্দ্বিক মনস্তত্বের শুদ্ধ এবং নির্ভীক মানসিকতার প্রতিচ্ছবি।

উল্লেখ্য যে, কল্লোল পত্রিকা আত্মপ্রকাশের অনেক আগেই নজরুল একজন সুপ্রতিষ্ঠিত কবি এবং গীতিকার। 'ফোর আর্টস ক্লাব' থেকে 'কল্লোলে'র প্রতিষ্ঠা। 'ফোর আর্টস ক্লাব' যাঁরা গঠন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে গোকুল চন্দ্র নাগ, দীনেশ রঞ্জন দাশ, সুনীতি দেবী, সতীপ্রসাদ সেন ছিলেন অন্যতম। 'ফোর আর্টস ক্লাব' নামকরণ করেছিলেন গোকুলচন্দ্র নাগ এবং এই ক্লাবের প্রথম সম্পাদক নিযুক্ত হন দীনেশ রঞ্জন দাশগুপ্ত। জাতিধর্ম, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলকে সদস্য করার নীতিও গৃহীত হয়। গঠনের পরপরই অনেকেই এই ক্লাবের সদস্য হন। এদের মধ্যে মণীন্দ্রলাল বসু, শান্তি চন্দ্র ঘোষ, সুধীরকুমার চৌধুরী, নিরুপমা দাশগুপ্ত, উমাদাশ গুপ্ত, সুকুমার দাশগুপ্ত, নগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, মীরা সান্যাল প্রমুখ অন্যতম। 'আড্ডা' দিয়ে শুরু হলেও গান, কবিতা পাঠ নিত্যকার বিষয় হিসেবে এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এ ক্লাবের সঙ্গে শিল্পী ও ভাস্কর অতুল বসু, ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, যামিনী রায়, দেবী প্রসাদ রায় চৌধুরী যুক্ত হন। পরবর্তীকালে প্রখ্যাত শিল্প সমালোচক অধ্যাপিকা স্টেলা ক্রামরিশ, পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, বিজয়চন্দ্র মজুমদার এই ক্লাবে আসা যাওয়া করেছেন। তবে নজরুল ইসলাম এখানে এলে আড্ডা জমে উঠত। কবিতা শুনিয়ে এবং গান গেয়ে তিনি আসর মাত করে দিতেন।

রবীন্দ্রনাথ এবং সত্যেন্দ্রনাথ 'সানডে' ক্লাবে আসা-যাওয়া করেছেন। কিন্তু 'ফোর আর্টস ক্লাব' এ কখনও যান নি। যা হোক, 'দু'বছর চলবার পর 'ফোর আর্টস ক্লাব' বন্ধ হয়ে যায়। এই ক্লাবের মাধ্যমে একটি গল্প সংকলন 'ঝড়ের দোলা' প্রকাশিত হয়। এতে সুনীতি দেবী, গোকুল চন্দ্র নাথ, মণীন্দ্রলাল বসু, দীনেশরঞ্জন দাশ, মোট ৪টি গল্প লেখেন। অতঃপর উমা দাশগুপ্ত 'ঘুমের আগে' নামে একটি গল্পের বই লেখেন। ছোটদের জন্য 'ছড়া' নামে একটি গ্রন্থও প্রকাশ পায়– 'ফোর আর্টস ক্লাব'-এর মাধ্যমে।

মাসিক কল্লোল পত্রিকার জন্মের বীজ নিহিত ছিল 'ফোর আর্টস ক্লাব' এ। ক্লাবটি বন্ধ হবার পরপরই দীনেশরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং গোকুলচন্দ্র নাগ 'কল্লোল' নামে পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। গোকুল নাগ ১ টাকা আট আনা এবং দীনেশরঞ্জন দুই টাকা, সর্বমোট ৩ টাকা আট আনা দিয়ে তাঁরা দু'জন 'কল্লোল' পত্রিকার একটি হ্যাণ্ডবিল ছাপিয়ে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে শিক্ষিত জনগণের মধ্যে তা বিলি করেন। দীনেশ বলেন, ১৩৩০ এর ১লা বৈশাখ ছাপানো 'কল্লোল' প্রকাশিত হয়। অবশ্য সতীপ্রসাদ সেন এর মতে চৈত্র সংক্রান্তির দিনে 'কল্লোল' সর্বপ্রথম বন্ধুদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। কী অসাধারণ শুরু। সাহিত্যের প্রতি এই মমত্ববোধ 'কল্লোলে'র সভ লেখকদের মধ্যে ছিল।

কল্লোলের কার্যালয় দীনেশ রঞ্জনের দাদার বাড়ী পটুয়াটোলা লেনের দু'খানা ঘরে স্থাপিত হয়। মানিকতলার একটি ছোট প্রেস থেকে প্রায় কয়েক মাস পত্রিকাটি ছাপা হয়। প্রায় সাত বৎসর 'কল্লোল' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল। 'কল্লোল' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ গল্পের মধ্যে হলেও কবিতা প্রকাশে সেখানে কোন বাধা ছিলনা এবং কবিতা নিয়মিত প্রকাশিত হয়েছে। শুধু গল্প-কবিতা নয়, গানও ছাপা হয়েছে। তবে গল্পের সংখ্যা বেশি ছিল। যাঁদের গান ছাপা হয়েছে তাঁদের মধ্যে নজরুল ইসলাম, অতুল প্রসাদ সেন, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ ছিলেন অন্যতম।

'কল্লোল' যুগ শুরু হবার অনেক আগেই কাব্যজগতে নজরুল এক বিদ্রোহের ঘোষণা দিয়েছিলেন। এ শুধু অন্যায়ের বিরুদ্ধে একটি চড়াগলার গগন বিদারী শব্দ মাত্র ছিল না, এই বিদ্রোহের ভাষায় এক অভাবনীয় শৈল্পিকভূষণ কাজ করেছে-যা দেখে পৃথিবী অবাক হয়েছে। 'চড়া' শব্দকে নজরুল শৈল্পিক ভাব, ব্যঞ্জনায় চির মধুর, চিরকল্যাণব্রতে নিঃসারিত করেছেন, জীবেন্দ্র সিংহ রায় তাঁর গ্রন্থ "কল্লোলের কালে" বলেন, কল্লোলে গল্প ও প্রবন্ধের চেয়ে কবিতায় বিদ্রোহের কথা বেশী পাই। এবং সে ক্ষেত্রে নজরুলই অগ্রগণ্য ভূমিকা নিয়েছিলেন। সত্য বটে 'বিদ্রোহী'র মতো কবিতায় হাবিলদার কবির চড়া গলায় যে সোচ্চার ধ্বনি শোনা গিয়েছিল কল্লোলের কবিতাগুলির মধ্যে সে ধ্বনি অনেকটা খাদে নেমে এসেছে। তবু তাঁর বীর্যকণ্ঠ কল্লোলে অন্তত প্রথম দিকে মাঝে মাঝে অল্প বিস্তার শোনা গিয়েছে-

ঝড় কোথা? কই?
বিপ্লবের লাল ঘোড়া ঐ ডাকে ঐ -
ঐ শোনো শোনো তার হ্রেষার চিককুর,
ঐ তার ক্ষুর-হানা মেঘে!-
না না আজ যাই আমি, আবার আসিব ফিরে,
হে বিদ্রোহী বন্ধুমোর! তুমি থাকো জেগে।
তুমি রক্ষী এ রক্ত অশ্বের,
হে বিদ্রোহী অন্তর্দেবতা! শুনশুন মায়াবিনী ঐ ডাকে ফের
পূবের হাওয়ায়-!
যায়-যায়-সব ভেসে যায়
পূবের হাওয়ায়-হায়! (ঝড়)

নজরুলের এই জাতীয় বিপ্লবাত্মক আইডিয়া কোনো কোনো নবীন-প্রবীণ লেখককেও উজ্জীবিত করেছিলো। তাই তাঁরা মাঝে মাঝে বিদ্রোহের সুর তুলেছেন কল্লোলের পৃষ্ঠায়। বিদ্রোহী কবির বলদর্শী মনোভাব ও দৃপ্ত অন্তঃশক্তি হয়তো তাঁরা পুরোপুরি আত্মসাত করতে পারেন নি, তবু তাঁদের কম্বুকণ্ঠ আমাদের উচ্চকিত করে তোলে-

ওঠ বীর, মুছে ফেল নিয়তির লিখা
আপন ললাট হতে;
যারা আসে ধেয়ে
পীড়নের আঘাত সহিয়া,
তাহাদের ক্ষতমুখ বাহি
যে শোণিত ঝরে আনিবার,
তব তপ্ত ভালে
সেই রক্ত-চিহ্ন আঁকি লহ!
- ওঠ বীর, দীনশরঞ্জন দাশ

নূতন ভাঙনে সনাতন পথ গেছে বা কোথাও ফাটি,
মাঝে মাঝে 'লিক' এমন গভীর বুকে ঠেকে যাবে মাটি।
তথাপি বন্ধু হতাশ হয়ো না, গরুর গাড়ীর গরু,
জাগুর কাটিয়া পার হতে পারে মরীচিকাহীন মরু।
- কাণ্ডারী, যতীন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত

কে তুমি বিদ্রোহী মোর বক্ষ মাঝে থেকে থেকে
করিছ গর্জন, -
যেথা ক্ষুদ্র জীবনের বিচিত্র তরঙ্গগুলি
করিছে নর্তন!
ভৈরব হুঙ্কারে হাঁকি কাঁপায়ে তুলিছ সারা
বুকের পঞ্জর
বাসনার অঙ্ক পরি প্রমত্ত তাণ্ডবে রত
হে প্রলয়ঙ্কর,- -বিদ্রোহী, বিভাবতী দেবী

জীবেন্দ্র সিংহ রায় তাঁর গ্রন্থে আরও লিখেছেন, "বাংলা সাহিত্যে (বিদ্রোহী কবিতায়) বিদ্রোহের একটা বিশেষরূপ রেখেছিলেন নজরুল ইসলাম। সে বিদ্রোহ উদ্বত, অবিনীত ও অপ্রতিরোধ্য।' (জীবেন্দ্র সিংহ রায় প্রাগুক্ত পৃ. ১৪৪)

বাংলা কাব্য সাহিত্যে নজরুল তাঁর এই বিদ্রোহ ভাবনার জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন। কল্লোল যুগের অনেক কবিই তাঁদের কবিতায় নজরুলকে অভিনন্দন জানিয়েছেন। ওপরোক্ত দুটো কবিতায় তা প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রথম কবিতাটি দীনেশ রঞ্জন দাশ এর লেখা। তিনিই মুখ্যত 'কল্লোল' পত্রিকার প্রাণপুরুষ ছিলেন। তাঁর একটি বড় সার্থকতা তিনি নজরুলকে কল্লোলে আনতে পেরেছিলেন এবং তাঁর আসাতে যে কল্লোল সমৃদ্ধ হয়েছিল সে সম্পর্কে জীবেন্দ্র সিংহ রায় বলেনঃ

"নজরুলের (১৩০৬) কবিতার প্রথম যথার্থ প্রকাশ 'প্রবাসী' তে (পৌষ, ১৩২৬) তারপর 'মোসলেম ভারত', 'ধূমকেতু' প্রভৃতি হয়ে তিনি আসেন 'কল্লোলে'র প্রথম বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যায় (জ্যৈষ্ঠ ১৩৩০)। কল্লোলের সঙ্গে তাঁর এই যোগাযোগ ঘটিয়ে দেন বন্ধুদ্বয় শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় ও পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়। তারপর থেকে কল্লোলের অন্ত রঙ্গ গোষ্ঠীর একজন হয়ে ওঠেন নজরুল; তাঁর কবিতা ও গান হয়ে ওঠে বাংলা সাহিত্যের পাঠক সমাজের অন্যতম আকর্ষণ। পত্রিকাটি আগের সংখ্যায় প্রচ্ছদপটে ঘোষিত হতো পরবর্তী সংখ্যায় নজরুলের কোন কবিতা বা গান প্রকাশিত হবে। শত্রুপক্ষ ও সংরক্ষণ পন্থীরা তাঁকে কল্লোলের অন্যতম নায়ক ধরে নিয়ে তাঁর উদ্দেশ্যে নিক্ষেপ করতেন বিদ্রুপের সুতীক্ষ্ণ শায়ক।

কিন্তু সমস্ত আক্রমণ সত্ত্বেও তিনি লিখে গেছেন পত্রিকাটির সপ্তমবর্ষ পঞ্চম সংখ্যা (ভাদ্র, ১৩২৬) পর্যন্ত। আর এই কারণে নজরুল কল্লোলের কবি বলেও পরিচিত।" (জীবন্দ্রে সিংহ রায়, পাক্ষিক, পৃ. ৯৬)

আমরা জানি নজরুলকে তাঁর লেখার জন্যই বারবার জেলে যেতে হয়েছে। সাহিত্যের জন্য এমন ভাবে জেলখাটা- কবি অন্য কোন দেশে ছিলেন কি না জানা নেই। এমনিভাবে একবার জেল থেকে মুক্তি পেয়ে নজরুল চলে আসেন কল্লোল অফিসে। এ প্রসঙ্গে জীবেন্দ্র সিংহ রায় বলেনঃ ".....কাজী (নজরুল) মুক্তি পাবার পরে পবিত্র বাবু বোধ হয় তাঁকে কল্লোল অফিসে নিয়ে আসেন। তারপর কতদিন যে কাজী বসে আসর জমিয়েছে তা আর বলা যায় না। গানে, গল্পে, উপন্যাসে প্রাণরসে উচ্ছল কবি মানুষটি।–"দে গরুর গা ধুইয়ে" বলে হাঁক ছেড়ে কাজী কল্লোল অফিসের দরজায় এসে হানা দিত। ঘরে ঢুকেই চৌকিতে বসে বার করতে এক ঝুলি– আরসী, চিরুণী, স্নো ইত্যাদিতে ঠাসা। ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া অসংযত চুলগুলিকে চিরুণীর সাহায্যে সুবিন্যস্ত করে মুখে স্নো লাগিয়ে একটু ঠাণ্ডা হয়ে শুরু করত আড্ডা। সকল কাজকর্ম বন্ধ–শোন কাজীর গান, গল্প ও হল্লা। কাজী চলে গেলে আবার সব চুপচাপ। ঝড়ের পরে স্তব্দতা....।" (জীবেন্দ্র সিংহ রায় পৃ. ৮৫)

কল্লোলে নজরুলের এমন আড্ডায় কথা চমৎকারভাবে বর্ণনা করেছেন অচিন্ত্য তাঁর "কল্লোল যুগে", বারান্তরে সে কথা বলব।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা প্রয়োজন যে কল্লোল পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রে অপর একজনের অবদান নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ; তাঁর নাম গোকুল চন্দ্র নাগ। গোকুল এবং দীনেশ দুই শিল্পী–বন্ধু মিলে সর্বপ্রথম কল্লোল পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। এ বিষয়ে শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেনঃ "কল্লোল" তখনও বের হয়নি। নজরুল তখন মুজাফ্ফর আহমদের কাছে বত্রিশ নম্বর কলেজ স্ট্রীটের দোতলায়। পবিত্র আর আমি যাচ্ছি নজরুলের আড্ডায়। পথে গোকুল নাগের সঙ্গে দেখা। গোকুলের সঙ্গে সেই আমার প্রথম পরিচয়। পবিত্র বললে, আর একজনকে দেখাই চল। গেলাম

পটুয়াটোলায়। দেখলাম দীনেশ দাশকে। গোকুল আর দীনেশ। দুই শিল্পী বন্ধু কল্লোল বের করার স্বপ্ন দেখছে।' (পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় জয়ন্তী সপ্তমতম জন্মদিবস উপলক্ষে) মহাজাতি সদন ১৯৬২ পৃ. ৩৯, কলিকাতা।) এরা দু'জন ছিলেন আর্ট স্কুলের ছাত্র। তবে ছবি আঁকা অপেক্ষা ছবির ব্লক নির্মণে তাঁদের উভয়ের ঝোঁক ছিল বেশি। নজরুল তাঁদের সাথে যুক্ত হলে এই দু'জনকে নিয়ে নজরুল 'কল্লোলে' একটি কবিতা প্রকাশ করেন–

সে কল–কল্লোল
সে হাসি হিল্লোল, নাই চিত উতরোল!
আজ সেই প্রাণ–ঠাসা এক মুঠো ঘরে
শূন্যের শূন্যতা বাজে, বুক নাহি ভরে।....
হে নবীন, অফুরন্ত তব প্রাণধারা
হয়তো এ মরুপথে হয়নিকো হারা,
হয়তো আবার তুমি নব পরিচয়ে
দেবে ধরা, হবে ধন্য তব দান লয়ে
কথা সরস্বতী।...
তুমি শিল্পী তুমি কবি দেখিয়াছে তারা
তাঁরা পান করে নাই তব–প্রাণ ধারা
'পথিকে' দেখেছে তারা দেখে নি 'গোকুলে;
ডুবে নিক–সুখী তারা–আজো তারা কুলে।'
(নজরুল ইসলাম; দীনেশরঞ্জন দাশ, গোকুল নাগ, কল্লোল, অগ্রহায়ণ ১৩৩২)

এই কবিতাটি নজরুল লিখেছিলেন মূলত, গোকুলচন্দ্র নাগকে নিয়ে। ১৯২৫ সালের ২৪শে সেপ্টেম্বর তাঁর মৃত্যু হয়। 'পথিক' ছিল তাঁর লেখা একটা উপন্যাস। সে সময় কল্লোলের প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৩০ থেকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। তিন সংখ্যা কার্তিক ১৩৩০, জ্যৈষ্ঠ ও আশ্বিন ১৩৩১ বাদে। গ্রন্থাকারে প্রকাশ ১৯২৫।

নজরুল তখন অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক। 'কল্লোলের' প্রচার সম্বন্ধে 'কল্লোল' কর্তৃপক্ষ সচেতন থাকতেন। প্রচ্ছদপটে তাই প্রায় সময় নজরুলের লেখা নিয়ে অগ্রিম ঘোষণা থাকতো; যেমন ১৩৩১ এর শ্রাবণ সংখ্যায়–উল্লেখ করা হতো–"ভাদ্রের কল্লোলে–কবি নজরুল ইসলামের 'পূবের হাওয়া' শেষ হইবে।"

এই নজরুল একদিন মোহিতলাল মজুমদারকে 'কল্লোল' পত্রিকা নিয়ে এসেছিলেন। অতঃপর পরবর্তীতে দু'জনের মধ্যে বিরোধ বাঁধে। তবে এ বিরোধ আস্তে আস্তে কমে আসে। তবে গুরু-শিষ্যের মিলন আর ঘটেনি।

এখানে বলা প্রয়োজন যে সে সময় নজরুলের কবি তরুণদের মনে দারুণ প্রভাব বিস্তার করেছিল। 'কল্লোল' পত্রিকায় বিভিন্ন কবির রচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

বলা যেতে পারে কল্লোল পত্রিকা নজরুলের 'বিদ্রোহ' কে নিয়েই নূতন ধারার কবিতা প্রকাশে উদ্বুদ্ধ হন। এই পত্রিকার লেখকেরা রবীন্দ্র ভাবনা এবং শব্দ অনুষঙ্গে সম্পূর্ণ ভিন্নতর বৈভব আনয়ন করেছিলেন।

নজরুলের যৌবনকে সামনে রেখে কল্লোলের কবিরা এই যৌবনের জয় পতাকা উড়িয়েই সাহিত্য জগতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। নজরুলের ভাব-ভাষা তাঁদের প্রাণীত করেছিল ঠিকই, কিন্তু আঙ্গিক নির্মাণে তাঁরা পাশ্চাত্যকে অনুসরণ করেছিলেন। নজরুল নিজেও পাশ্চাত্যের এই পদ্ধতি অবলম্বনে তাঁর 'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে' কবিতাটি লিখেছিলেন। কবিতাটি কল্লোল পত্রিকায় ছাপা হয়েছিল। নজরুল যে এই তরুণ কবিদের কতদূর প্রভাবিত করেছিলেন তাঁর প্রমাণ পাওয়া যায়–জীবেন্দ্র সিংহ রায়ের বক্তব্যেঃ

"কল্লোল গোষ্ঠী তাঁদের প্রায়–কিশোর মান নিয়ে জীবনের মুখোমুখি হয়েছিলেন প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর কালপরিবেশে। সে যুগের নূতন মানুষের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁদের ক্ষেত্রেও উপস্থিত ছিল সন্দেহ নেই, তবু তাদের সাহিত্যিক মনের রসায়নে সেই বৈশিষ্ট্যগুলি কীভাবে কতখানি সংরক্ষিত ও সংহত হয়েছিল সেটাই কল্লোল যুগের সাহিত্য বিচারে প্রধান লক্ষণীয়।...

যৌবনের জয় পতাকা উড়িয়ে কল্লোল গোষ্ঠীর সাহসিক আবির্ভাব। যে ভাবগ্রন্থি বা বীজকোষ তাদের সাহিত্যচর্চার মূলগত প্রেরণ জুগিয়েছে তা হচ্ছে যৌবনের সজীবতা। তারুণ্যমন্ত্র তাঁদের প্রাণমন্ত্র। প্রাজ্ঞতা ও বিজ্ঞতা নয়, স্থির বুদ্ধির বিবেচনাও নয়, আবেগত তাড়িত যৌবন–ধর্মের অবিবেচনাই ছিল তাদের পথ চলার পাথেয়। তাই বিচার নয়–সদর্প আত্মপ্রকাশে তাদের উজ্জীবিত হতে দেখি।" (জীবেন্দ্র সিংহ রায় কল্লোলের কাল, কালিকাতা ১৯৮৭, পৃ. ১৩২।) বলাবাহুল্য, নজরুলই ছিলেন সেদিন তাঁদের আদর্শ। তাঁর যৌবন, তাঁর আবেগ তাদেরকে সেদিন সাহসী করে তুলেছিল।

কল্লোলের কবিরা সেদিন যৌবনোচিত সংগ্রামের মধ্য দিয়ে পথ চলেছে। তবে একথা ঠিক, যে কল্লোলের কবিরা এই টুকুর মধ্যে সীমায়িত থাকেননি। 'সেক্স' বা যৌনজীবন কল্লোল গোষ্ঠীর একটা প্রধান চিন্তার বিষয় ছিল এবং এক্ষেত্রেও তারা ছিলেন পাশ্চাত্যের অনুসারী। এই যুগে কবিতা, গ্রন্থে, উপন্যাসে যৌন জীবনের ছড়াছড়ি ছিল। মোপাঁসা, বালজাক, এমিলি জোলার পাশাপাশি লরেন্স, জয়েসী এমন কি রুশ লেখক তলস্তয়, দস্তভয়েস্কী প্রমুখ সাহিত্যিকগণের সঙ্গে ফরাসী কবি বোদলেয়ার, ইয়েটস, এলিয়ট, এজরা ইংরেজ কবি প্রমুখদের প্রভাবও কম ছিল না। এক্ষেত্রে মালার্মের কবিতায় একদিন প্রতিদিনের নিত্য ব্যবহৃত শব্দের যে প্রতীকী দ্যোতনার পরিচয় পাওয়া যায়–কল্লোলের কবিদের রচনায় তার আভাস রয়েছে। অবশ্য কবিতার ভাষা ও শব্দ ব্যবহারে নজরুল যে আবহ সৃষ্টি করেছিলেন, বিশেষ করে বিদ্রোহীর ধ্বনি-মাধুর্য এবং সূক্ষ্ম কলাকৌশল যা অনেকটাই সঙ্গীতের ব্যঞ্জনা, কল্লোলের কবিরা তাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বলা যেতে পারে, বাংলা সাহিত্যে কাব্য ক্ষেত্রে শব্দ ব্যবহারে নজরুল

নূতন রীতি এনেছিলেন। কবিতার ভাষা-ব্যবহারে এই যে নূতন উদ্যোগ কল্লোলের কবি হিসেবে তার শিরোপা নজরুলেরই প্রাপ্য। কবিতায় এই কাব্যকলার প্রয়োগ নজরুল-পূর্ব কবিতায় অভাবনীয় ছিল। এ প্রসঙ্গে সৈয়দ আলী আহসান বলেনঃ "বিদ্রোহী কবিতাটি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একটি প্রবল এবং বিক্ষুব্ধ জলোচ্ছ্বাসের মতো। এ কবিতার মূল আবেদন যৌবনের অসম সাহসিকতার কাছে এবং তরুণ মনের অবিবেচনার কাছে। মানব চিত্তের চাঞ্চল্যের যে একটা ইতিহাস আছে এবং সময় আছে নজরুল ইসলাম তাকে পূর্ণভাবে আলোড়িত করেছিলেন। এ কার্যে নজরুল ইসলামকে সাহায্য করেছে তাঁর ছন্দ, চরণান্তে মিলের বৈচিত্র্য, প্রভুত সংখ্যক বিশেষ্যের সমাহার এবং অবশেষে শব্দ ব্যবহারে সর্বাংশে কবির দ্বিধাহীনতা। নজরুল ইসলামের এই স্বভাব রবীন্দ্রনাথের কবি স্বভাবের বিপরীত।" সৈয়দ আলী আহসান, আধুনিক বাংলা কবিতা; শব্দের অনুষঙ্গে, ঢাকা ১৯৭০, পৃ. ১৭-১৮)

বস্তুত, নজরুলের হাতে বাংলা কবিতার ভাব ও বাক্যবিন্যাস এবং তার বাণীভঙ্গি একটি নূতনত্ব পেয়েছিল, রবীন্দ্রনাথে তা একেবারে অনুপস্থিত। নজরুল সহসা বাংলা কাব্যজগতে আবির্ভূত হয়ে কবিতার পেলব কোমলতাকে পরিহার করে যৌবনের উদ্দামতার হিল্লোলকে প্রাধান্য দিলেন। এমন কাব্যাভাস রবীন্দ্রযুগে ছিল না।"

তোরা সব জয়ধ্বনি কর
ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবৈশাখীর ঝড়
তোরা সব জয়ধ্বনি কর।

বাংলা কাব্যজগতের এই পালাবদল নজরুলের হাতেই হয়েছিল এবং পরবর্তী কবিরা তাকে নূতনত্বের গভীরে নিয়ে গিয়েছিলেন। কবিতায় গতিবেগ এসেছে, কোন স্থবিরতা থাকেনি। জীবন প্রাধান্য পেয়েছে তাঁর দুঃখ, শোক এবং আনন্দ নিয়ে। কল্পনায় বাস্তবতা এসেছে, প্রেমে বিরহ মূল সুর হলেও মিলনের প্রত্যাশা কমেনি। কবিতায় ক্লেদজ ভাবনা কুসুমিত হয়েছে। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এটাই ছিল নজরুলের বড় অবদান।

নজরুলের নেতৃত্বে কল্লোল যুগের কবিতা এই পালাবদলে কবিতার একটা নূতন রূপ দিতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নজরুলের অত্যন্ত ঘনিষ্টবন্ধু ছিলেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত। বয়সে ছোট হলেও বন্ধুত্বে তাঁরা খুব কাছের মানুষ ছিলেন একে অপরের। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে নজরুলকে অসাধারণভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। গোটা গ্রন্থে গল্পচ্ছলে তিনি বাংলা সাহিত্যে নজরুলের আবির্ভাব এবং জনমনে তাঁর প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন।

নজরুলের আর একজন বন্ধু ছিলেন নৃপেন্দ্র কৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। তিনিও বয়সে নজরুলের অনেক ছোট। কিভাবে নৃপেন্দ্রকৃষ্ণের সঙ্গে নজরুলের পরিচয় হয়েছিল তাঁর একটি চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত।

"একদিন তাঁর ছাত্র নৃপেনকে বললে ; জানেন মাস্টার মশাই আজ বাগচি বাড়িতে 'বিদ্রোহী'র কবি কাজী নজরুল ইসলাম আসছেন।' 'বিদ্রোহী'র কবি। "আমি ইন্দ্রাণী-সূত, হাতে চাঁদ ভালে সূর্য, মম এক হাতে বাঁকা বাঁশের বাঁশরী আর হাতে রণতুর্য।" "আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান-বুকে এঁকে দেই পদচিহ্ন, আমি খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব ভিন্ন" সেই বিদ্রোহীর কবি? কেমন না জানি দেখতে! রাস্তার উপর উৎসুক জনতা ভিড় করে আছে আর ঘরের মধ্যে কে একজন তরুণ গাইছে তারস্বরে। সন্দেহ কি, শুধু 'বিদ্রোহী'র কবি নয়, কবি-বিদ্রোহী। তার কণ্ঠস্বরে প্রাণবন্ত প্রবল পৌরষ, হৃদয়স্পন্দী আনন্দের উত্তালতা। গ্রীষ্মের রুক্ষ আকশে যেন মনোহর ঝড় হঠাৎ ছুটি পেয়েছে। কর্কশের মাঝে মধুরের অবতারণা। নিজের অলক্ষ্যে কখন ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়েছে নৃপেন। সমস্ত কুণ্ঠার কালিমা নজরুলের গানে মুছে গেছে। শুধু কি তাই? গানের শেষে অতর্কিতে সাহিত্য আলোচনায় যোগ দিয়ে বসেছে নৃপেন। কথা হচ্ছিল রুশ সাহিত্য নিয়ে, সব সুমহান পূর্ব-সুরিদের সাহিত্য–পুশকিন, টলস্টয়, গোর্কি, দস্তভয়েস্কি।

নৃপেন রুশ সাহিত্যে মশগুল, প্রত্যেকটি প্রখ্যাত বই তার নখমুকুরে। তাছাড়া সেই তরুণ বয়সে সব সময় নিজেকে জাহির করার উত্তেজনাতো আছেই। কে যেন দস্ত য়ভস্কির কোন উপন্যাসের চরিত্রের নাম ভুল করেছে, নৃপেন তা সবিনয়ে সংশোধন করলে। সঙ্গে-সঙ্গে প্রমাণ করলে তার প্রত্যক্ষ পরিচয়ের বিস্তৃতি। সকলের বিস্মিত চোখ পড়ল নৃপেনের উপর। নজরুলের চোখ পড়ল নবীন বন্ধুতার।

ঘর থেকে নেমে এসেছে পথে, পিছন থেকে কে ডাকল নৃপেনকে। কি আশ্চর্য! 'বিদ্রোহী' কবি স্বয়ং, আর তাঁর সঙ্গে তাঁর বন্ধু আফজলউল হক–"মোসলেম ভারত" কর্ণধার। মানে, যে কাগজে 'বিদ্রোহী' ছাপা হয়েছে সেই কাগজের। সুতরাং নৃপেনের চোখে আফজল ও প্রকাণ্ড কীর্তিমান। আর, 'প্রবাসী'র যেমন রবীন্দ্রনাথ, 'মোসলেম ভারতে' তেমনি নজরুল। নজরুল বললে, 'আপনার সঙ্গে আলাপ করতে চাই।' 'তাহলে আসুন হাঁটি।'

নৃপেন তখন থাকে চিংড়িঘাটায়, কলকাতার পূর্ব উপান্তে। নজরুল আর আফজল চলে এল নৃপেনের বাড়ি পর্যন্ত। নৃপেন বললে, আপনারা পথ চিনে ফিরতে পারবেন না, চলুন এগিয়ে দিই। এগিয়ে দিতে চলে এল কলেজ স্ট্রীট, নজরুলের আস্তানা। এবার ফিরি, বললে নৃপেন। নজরুল বললে, চলুন ফের এগিয়ে দিই আপনাকে। কি কথা? নজরুল বললে, পথতো চিনে ফেলেছি ইতিমধ্যে।

রাত গভীর হয়ে এল, সঙ্গে-সঙ্গে গভীর হয়ে এল হৃদয়ের কুটুম্বিতা। দৃঢ় করে বাঁধা হয়ে গেল গ্রন্থি। নজরুল বললে, 'ধূমকেতু' নামে এক সাপ্তাহিক বের করছি। আপনি আসুন আমার সঙ্গে। আমি মহাকালের তৃতীয় নয়ন, আপনি ত্রিশুল। আসুন দেশের ঘুম ভাঙাই, ভয় ভাঙাই–

নৃপেন উৎসাহে ফুটতে লাগল। বললে, এমন শুভ কাজে দেবতার কাছে আশীর্বাদ ভিক্ষা করবেন না? তিনি কি চাইবেন মুখ তুলে? তবু নজরুল শেষ মুহূর্তে তাকে

টেলিগ্রাম করে দিল। রবীন্দ্রনাথ কবে কাকে প্রত্যাখান করেছেন? তাছাড়া, এ নজরুল যার কবিতায় পেয়েছেন তিনি তপ্ত প্রাণের নতুন সজীবতা। শুধু নামে আর টেলিগ্রামেই তিনি বুঝতে পারলেন, 'ধূমকেতু'র মর্মকথা কি। যৌবন কে 'চিরজীবি' আখ্যা দিয়ে 'বলাকায়' তিনি আধ-মরাদের ঘা মেরে বাঁচাতে বলেছিলেন সেটাতে রাজনীতি ছিল না, কিন্তু এবার 'ধূমকেতু' কে তিনি যা লিখে পাঠালেন তা স্পষ্ট রাজনীতি, প্রত্যক্ষ গণজাগরণের সংকেত।

আয় চলে আয় রে ধূমকেতু
আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,
দুর্দিনের এই দুর্গশিরে
উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন,
অলক্ষণের তিলকরেখা
রাতের ভালে হোক না লেখা,
জাগিয়ে দেরে চমক মেরে
আছে যারা অর্ধচেতন।

সাত নম্বর প্রতাপ চাটুজ্জের গলি থেকে বেরুল 'ধূমকেতু'। ফুলস্কাপ সাইজ, চার পৃষ্ঠার কাগজ, দাম বোধ হয় দু'পয়সা। প্রথম পৃষ্ঠায় সম্পাদকীয় প্রবন্ধ, আর তার ঠিক উপরে রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখা ব্লক করে কবিতাটি ছাপানো।

নৃপেনের মতো আমিও ফাস্ট ইয়ারের ছাত্র। সপ্তাহান্তে বিকেল বেলা আরো অনেকের সঙ্গে জগবাবুর বাজারের মোড়ে দাঁড়িয়ে থাকি, হকার কতক্ষণে 'ধূমকেতু'র বাণ্ডিল নিয়ে আসে। হুড়োহুড়ি কাড়াকাড়ি পড়ে যায় কাগজের জন্যে। কালির বদলে রক্তে ডুবিয়ে ডুবিয়ে লেখা সেই সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ। সঙ্গে 'ত্রিশুলের' আলোচনা। শুনেছি স্বদেশী যুগের "সন্ধ্যা" তে ব্রহ্মবান্ধব এমনি ভাষাতেই লিখতেন। সে কী কশা, কী দাহ! একবার পড়ে বা শুধু একজনকে পড়িয়ে শান্ত করবার মত সে লেখা নয়। যেমন গদ্য তেমনি কবিতা। সব ভাঙার গান, প্রলয়–বিলয়ের মঙ্গলাচরণ।..... ধূমকেতুর সে সব সম্পাদকীয় প্রবন্ধ সংকলিত থাকলে বাংলা সাহিত্যের একটা স্থায়ী উপকার হত। অন্তত, সাক্ষ্য থাকত বাঙলা গদ্য কতটা কাব্যগুণান্বিত হতে পারে, "প্রসন্নগম্ভীরপদা স্বরস্বতী" কি করে বিনিষ্ক্রান্তাসিধারিণী' সংহার কত্রী মহাকালী হতে পারে। প্রসাদরম্য ললিত ভাষায় কি করে উৎসারিত হতে পারে অগ্নিগর্ভ অঙ্গীকার। একটা প্রবন্ধের কথা এখনো মনে আছে–নাম "ম্যয় ভুখা হুঁ"। মহাকালী ক্ষুধার্ত হয়ে নবমুণ্ডের লোভে শ্মশানে বেরিয়েছেন তারই একটা ঘোরদর্শণ বর্ণনা। বোধ হয় সে–সংখ্যাটি কালীপূজার সন্ধ্যায় বেরিয়েছিল। কালীপূজার দিন সাধারণ দৈনিক বা সাপ্তাহিক কাগজে যে মামুলি প্রবন্ধ বেরোয়–মুখস্তকরা কতকগুলো সমাসবদ্ধ কথা–এ সে

জাতের লেখা নয়। দীপান্বিতার রাত্রির পরেই এ-দীপ নিভে যায় না। বাঙলাদেশের চিরকালীন যৌবনের রক্ত এর দ্যুতি জ্বলতে থাকে।

'ধূমকেতু' তে একটা কবিতা পাঠিয়েদিলাম। অর্থাৎ, একটা সাকো ফেললাম নজরুলকে গিয়ে ধরবার জন্যে। সেই কবিতাটা ঠিক পরবর্তী সংখ্যায় বেরুল না। অনুৎসাহিত হবার কথা, কিন্তু আমার স্পর্ধা হলো নজরুল ইসলামের কাছে গিয়ে মুখোমুখি জবাবদিহি নিতে হবে। গেলাম তাই একদিন দুপুরবেলা। রঙিন লুঙ্গি পরণে, গায়ে আঁট গেঞ্জি-অসম্পাদকীয় বেশে নজরুল বসে আছে তক্তপোশে-চারদিকে একটা অন্তরঙ্গ আবহাওয়া ছড়িয়ে। 'অগ্নিবীণা'র প্রথম সংস্করণে নজরুলের একটা ফটো ছাপা হয়েছিল সেটাই বড়বেশি কবি-কবিভাব-এখন চোখের সামনে একটা মানুষ দেখলাম, স্পষ্ট, সহজ প্রাণপূর্ণ পুরুষ। বললাম-আমার কবিতার কি হল? নজরুল চোখ তুলে চাইল: কোন কবিতা? বললাম-আপনার কবিতা যখন 'বিদ্রোহী', আমার কবিতা 'উচ্ছৃঙ্খল'। হাহাহা করে নজরুল হেসে উঠল। বললে-আপনি মনোনীত হয়েছেন।

কবিতাটা ছাপা হয়েছিল কিনা জানিনা। হয়তো হয়েছিল, কিংবা হয়তো তারপরেই নজরুলকে ধরে নিয়ে গেল পুলিশে। কিন্তু তার সেই কথাটা মনের মধ্যে ছাপা হয়ে রইল; আপনি মনোনীত হয়েছেন।

নজরুলকে কিসের জন্য ধরলে জানো? জিগগেস করলে নৃপেন। কিসের জন্যে?

আগে লিখেছিল-রক্তাম্বর পর্ মা এবার জ্বলে পুড়ে যাক শ্বেতবসন। দেখি ঐ করে সাজে মা কেমন বাজে তরবারি ঝনন ঝন।" এবারে লিখলে -"আর কতকাল রইবি বেটি মাটির ঢেলার মূর্তি-আড়াল? স্বর্গ যে আজ জয় করেছে অত্যাচারী শক্তি চাঁড়াল!" এই লেখার জন্যে নজরুলের এক বছর জেল হয়ে গেল। সে যা জবানবন্দি দিলে তা শুধু সত্য নয়, সাহিত্য।' পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় বসেছিল একপাশে। বললে, 'তার জেলের কাহিনীটা আমার কাছ থেকে শোনো।' 'তোমার সঙ্গে নজরুলের আলাপ হলো কবে?' নজরুল যখন করাচিতে যখন ও শুধু কবি নয়, হাবিলদার কবি। পল্টনে লেফট রাইট করতে হত তাকে। পল্টনও এমন পল্টন, লেফ্‌ট রাইট বোঝে না। তখন এক পায়ে ঘাস ও অন্যপায়ে বিচালি বেঁধে দিয়ে বলতে হত, ঘাস-বিচালি ঘাস। সেই সময়কার থেকে চেনা। আমি তখন 'সবুজপত্রে'- হঠাৎ অপ্রত্যাশিত একটা চিঠি আসে করাচি থেকে, সঙ্গে ছোট একটি কবিতা। লেখক উনপঞ্চাশ নম্বর বাঙালি পল্টনের একজন হাবিলদার, নাম কাজী নজরুল ইসলাম। কবিতাটি বড্ড রবীন্দ্রনাথ ঘেঁষা। স্বকীয়তা খুঁজে পেলেন না বলে চৌধুরী মশায়ের পছন্দ হলনা। আমার কিন্তু ভালো লেগেছিল। কবিতাটি নিয়ে গেলাম 'প্রবাসী'র চারু বাবুর কাছে। চারুবাবু খুশী হয়ে ছাপলেন সে কবিতা। বললেন আরও চাই। এক জায়গায় পাঠানো কবিতা অন্য জায়গায় চালিয়ে দিয়েছি লেখকের সম্মতি না নিয়ে, কুণ্ঠিত হয়ে চিঠি লিখলাম নজরুলকে। "দে গরুর গা ধুইয়ে"-নজরুল

তা থোড়াই কেয়ার করে। প্রশান্ত সাধুবাদ দিয়ে চিঠি লিখলে আমাকে, এতটুকু ভুল বুঝলেনা। নবীন আগন্তুককে প্রবেশ-পথে যে সামান্য সাহায্য করেছি এতেই তার বন্ধুতা যেন কায়েম করলে। তারপর পল্টন ভেঙে দেবার পর যখন সে কলকাতা ফিরল, ফিরেই ছুটল 'সবুজপত্রে' আমাকে খোঁজ করতে।'

একদিন জোড়াসাঁকো থেকে খবর এল-রবীন্দ্রনাথ পবিত্রকে ডেকেছেন। কি ব্যাপার? ব্যাপার রোমাঞ্চকর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'বসন্ত' নাটিকাটি নজরুলের নামে উৎসর্গ করেছেন। এখন একখানা বই ওকে জেলখানায় পৌঁছে দেওয়া দরকার। পারবে নাকি পবিত্র? নিশ্চয় পারব। উৎসর্গ পৃষ্ঠায় রবীন্দ্রনাথ নিজের নাম লিখে দিলেন। উৎসর্গ-পৃষ্ঠায় ছাপা ছিল: শ্রীমান কবি কাজী নজরুল ইসলাম কল্যাণীয়েষু।' তার নিচে তাঁর কাঁচা কালির স্বাক্ষর বসল। শুনেছি তার আশেপাশে যে সব উন্নাসিক ভক্তের দল বিরাজ করত তারা কবির এই বদান্যতায় সেদিন বিশেষ খুশি হতে পারে নি। কিন্তু তিনি নিজেতো জানতেন কাজী নজরুল তারই পরেকার যুগে প্রথম স্বতন্ত্র কবি, স্বীকার করতে হবে তার এই শক্তিদীপ্ত বিশিষ্টতাকে। তাই তিনি তাঁর অন্তরের স্নেহ ও স্বীকৃতি জানাতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করলেন না। "শ্রীমান" ও "কবি" এই কথা দুটির মধ্যে তার সেই গভীর স্নেহ ও আন্তরিকতা অক্ষয় করে রাখলেন।"

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'কল্লোল যুগ' গ্রন্থে নজরুল সম্পর্কে আরও বলেনঃ

"নজরুল মিঠে পান ও জর্দা ভালোবাসে, আর ভালোবাসে বেজলিন স্নো। এই সব ও আরো কটা কি বরাতী জিনিষ নিয়ে পবিত্র একদিন আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের দুয়ারে হাজির, নজরুলের সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে। লোহার বেড়ার ওপর থেকে নজরুল চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলে-সব এনেছিস তো? পবিত্র হাসল। কী জানে নজরুল, কী জিনিষ পবিত্র আজ নিয়ে আসছে তার জন্যে। কী দেবতা-দুর্লভ উপহার। কী এনেছিস? চেঁচিয়ে উঠল নজরুল। পবিত্র বললে, তোর জন্যে কবিকণ্ঠের মালা এনেছি। বলে, 'বসন্ত' বইখানা তাকে দেখাল। নজরুল ভাবলে রবীন্দ্রনাথের 'বসন্ত' কাব্য নাট্যখানা নিয়েই পবিত্র বুঝি একটু কবিয়ানা করছে। এই দ্যাখ। উৎসর্গ পৃষ্ঠাটা পবিত্র খুলে ধরল তার চোখের সামনে। আর কী চাস। সবচেয়ে বড় স্তুতি আজ তুই পেয়ে গেলি। তার চেয়েও হয়তো বড় জিনিষ। রবীন্দ্রনাথের স্নেহ।"

রবীন্দ্রনাথ যে নজরুলকে দেশের ও সাহিত্যের একটা দামী সম্পদ বলে মনে করতেন তার আর একটা প্রমাণ আছে। নজরুল যখন হুগলী জেলে অনশন করছে তখন রবীন্দ্রনাথ ব্যস্ত হয়ে তাকে টেলিগ্রাম করেছিলেন - Give up hunger strike. Our literature claims you। টেলিগ্রাম করেছিলেন প্রেসিডেন্সি জেলে। সেই টেলিগ্রাম ফিরে এল রবীন্দ্রনথের কাছে। কর্তৃপক্ষ লিখে পাঠাল Addressee not found অচিন্ত্য লেখেন, "এই সময় একটা মজার ঘটনা ঘটেছিল। পবিত্র তা চেপে যাচ্ছে' বললেন নলিনীকান্ত সরকার, আমাদের নলিনীদা। কৃষ্ণের যেমন বলরাম, নজরুলের তেমনি

নলিনীদা। হাসির গানের তানসেন। নজরুল গায় আর হাসে, নলিনীদা গান আর হাসান। নজরুলের পার্শ্বাস্থি বলা যেতে পারে। নজরুলকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, নলিনীদা'র কাছে সন্ধান নাও। নজরুলকে সভায় নিয়ে যেতে হবে নলিনীদাকে সঙ্গে চাই। নজরুলকে দিয়ে কিছু করতে হবে, ধরো নলিনীদাকে, নজরুল সম্বন্ধে সবচেয়ে বেশি ওয়াকিবহাল।

'শোনো সে মজার কথা। আলিপুর সেন্ট্রাল জেল থেকে নজরুল তখন বদলি হয়েছে হুগলি জেলে। হুগলি জেলে এসে নজরুল জেলের শৃঙ্খলা ভাঙতে শুরু করল, জেলও চাইল তার পায়ে ভালো করে শৃঙ্খল পরাতে। লেগে গেল সংঘাত। শেষকালে নজরুল হাঙ্গার স্ট্রাইক করলে। আটাশ দিনের দিন সবাই আমাকে ধরলে জেলে গিয়ে নজরুলকে যেন খাইয়ে আসি। জানতাম নজরুল মচকাবার ছেলে নয়, তবু ভাবলাম একবার চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি কি! গেলাম হুগলি জেলের ফটকে। আমি আর সঙ্গে সকল অগতির গতি, এই পবিত্র। জেলে ঢুকতে পারলাম না, অনুমতি দিলেন না কর্তারা। হতাশ মনে ফিরে এলাম, হুগলি স্টেশনে। হঠাৎ নজরে পড়ল প্লাটফর্মের গা ঘেঁসেই জেলের পাঁচিল উঠে গেছে। মনে হল জেলের পাঁচিলটা একবার কোনোরকমে ডিঙ্গোতে পারলেই নজরুলের সামনে সটান চলে যেতে পারব। আর এভাবে জেলের মধ্যে একবার ঢুকতে পারলে সহজে যে বেরুনো চলবে না তা এই দিনের আলোর মত স্পষ্ট। তবু বিষয়টা চেষ্টা করে দেখাবার মতো। পবিত্রকে বললাম, তুমি আগে উবু হয়ে বসো, আমি তোমার দু'কাঁধের উপর দু'পা রেখে দাঁড়াই দেয়াল ধরে। তারপর তুমি আস্তে আস্তে দাঁড়াতে চেষ্টা করো। তোমার কাঁধের থেকে যদি একবার লাফ দিয়ে পাঁচিলের উপর উঠতে পারি, তবে তুমি আর এখানে থেকো না। স্রেফ হাওয়া হয়ে যেয়ো। বাড়তি আরেকজনের জেলে যাওয়ার কোন মানে হয় না।

বেলা তখন প্রায় দুটো, প্লাটফর্মে যাত্রীর আনাগোনা কম। 'য়্যাকর্ডিং টু প্লান' কাজ হল। পবিত্রর কাঁধের থেকে পাঁচিলের মাথায় কায়ক্লেশে প্রমোশন পেলাম। প্রমোশন পেয়েই চক্ষু চড়কগাছ! ভিতরের দিকে প্রকাণ্ড খাদ-খাই প্রায় অন্তত চল্লিশ হাত। বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখি পবিত্রর নামগন্ধ নেই। যা হবার তাই হবে, দু'দিকে দু'ঠ্যাং ঝুলিয়ে জাঁকিয়ে বসলাম পাঁচিলের উপর ঘোড় সওয়ারের মত। যে দিকে নামাও সেই দিকেই রাজি আছি–এখন নামতে পারাটাই কাম্যকর্ম। কিন্তু কই, জেলখানার ভিতরের মাঠে লোক কই? খানিকপর স্যামধ্যায়ী মশাইকে দেখলাম–মোক্ষদারচণ সামধ্যায়ী। বেড়াতে বেড়াতে একটু কাছে আসতেই চিৎকার করে বললাম, নজরুলকে ডেকে দিন। নজরুলকে।

সার্কাসের ক্লাউন হয়ে বসে আছি পাঁচিলের উপর। জেলখানার কয়েদীরা দলে-দলে এসে মাঠে জুটতে লাগল বিনা টিকিটে সে সার্কাস দেখবার জন্যে। দুটি বন্দী যুবকের

কাঁধে ভর দিয়ে দূর্বল পায়ে টলতে টলতে নজরুলও এগিয়ে আসতে লাগল। বেশি দূর এগুতে পারল না, বসে পড়ল। গলার স্বর অতদূরে পৌঁছুবে না, তাই জোড়হাত করে ইঙ্গিতে অনুরোধ করলাম যেন সে খায়। প্রত্যুত্তরে নজরুলও জোড়হাত করে মাথা নেড়ে ইঙ্গিত করল এ অনুরোধ অপাল্য।

এতো জানা কথা। এখন নামি কি করে? পবিত্র যে ঠিক "ধরো লক্ষণের" মতই অবিকল ব্যবহার করবে এ যেন আশা করেও আশা করিনি। গাছে তুলে মই কেড়ে নেওয়ার চেয়ে পাঁচিলে তুলে কাঁধ সরিয়ে নেওয়া ঢের বেশী বিপজ্জনক। কিন্তু ভয় নেই। স্টেশনের বাবুরা ভিড় করে দাঁড়িয়ে আমার চৌদ্দপুরুষের আদ্য কি করে বলি– শেষ শ্রাদ্ধ করছেন। ধরণী, সিধা হও, বলে পাঁচিল থেকে পড়লাম লাফ দিয়ে। স্টেশনের মধ্যে আমাকে ধরে নিয়ে গেল, পুলিশের হাতে দেয় আর কি? অনেক কষ্টে বোঝানো হল যে আমি সন্ত্রাসবাদীদের কেউ নই। ছাড়া পেয়ে গেলাম। অবিশ্যি তারপর পবিত্র কাছছাড়া হল না–'

তারপর নজরুল অনশন ভাঙলো তো?

ভাঙলো চল্লিশ দিনের দিন। আর তা শুধু তার মাতৃসমা বিরজা সুন্দরী দেবীর স্নেহানুরোধে।

অচিন্ত্য বলছেন, "নজরুলের বিদ্রোহ, প্রতিজ্ঞার দৃঢ়তা ও আত্মভোলা বন্ধুত্বের পরিচয় পেলাম। তারপর স্বাদপাব তার দারিদ্র্যজয়ী মুক্তপ্রাণের আনন্দ, বিরতিহীন সংগ্রাম ও দায়িত্বহীন বোহিমিয়ানিজম-এর। সবই সেই কল্লোলযুগের লক্ষণ।" (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, কল্লোল যুগ, পৃ. ২৫-২৯)

অসাধারণ বিবরণ বন্ধুত্বের। পবিত্র, নৃপেন, নলিনী, অচিন্ত্য এবং নজরুল– এক আত্মা, এক প্রাণ, এক মনুষ্যত্ব। নজরুল যে সময় কল্লোল যুগের প্রাণ পুরুষ ছিলেন সে সময়ে একথা 'কল্লোল পত্রিকার' সকলে তা জানতেন। নজরুল পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের হাত ধরে চলে এলেন কল্লোলে। পবিত্র যখন জেলে নজরুলকে 'বসন্ত' নাটক উপহার দিতে গিয়েছিলেন তখনই নজরুল কথা দেন নতুন কবিতা লিখবেন পবিত্রর ফরমায়েসে।

অচিন্ত্য লিখলেন : "কল্লোলের জন্য কবিতা। লালকালিতে লেখা কবিতা। জেল থেকে এল একদিন সেই কবিতা–সত্যি সত্যিই লাল কালিতে লেখা–'সৃষ্টি সুখের উল্লাসে।"

আজকে আমার রুদ্ধ প্রাণের পল্বলে
বান ডেকে ঐ জাগল জোয়ার দুয়ার–ভাঙা কল্লোলে।
আসল হাসি আসল কাঁদন আসল মুক্তি আসল বাঁধন,
মুখ ফুটে আজ, বুক ফাটে মোর তিক্ত দুখের সুখ আসে,
রিক্ত বুকের দুখ আসে––
আজ সৃষ্টি সুখের উল্লাসে ॥

এই কবিতা ছাপা হল 'কল্লোলের' প্রথম কি দ্বিতীয় সংখ্যায়। কবিতাটির জন্য পাঁচ টাকা দেওয়া হয়েছিল। জেলে সেই টাকা পবিত্র পৌঁছে দিয়েছিল নজরুলকে।" (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাযুক্ত পৃ. ৩২)

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তের 'কল্লোল যুগ' কল্লোল পত্রিকার সাহিত্যিকদের নিয়ে লেখা এক অসাধারণ প্রাণস্পর্শী গ্রন্থ। গ্রন্থটি অসাধারণ এ কারণে যে অচিন্ত্যকুমার গল্প বলার মাধ্যমে সে সময়ে সাহিত্যের পালাবদলে কল্লোল যুগের লেখকদের ভূমিকা অনবদ্যভাবে তুলে ধরেছেন। এ গ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে আছে নজরুলের জীবন ও কাব্যচর্চা। সে সময়ে নজরুল বিদ্রোহী কবি হিসেবেই সমগ্র বাঙালী জাতিকেই তাক লাগিয়ে দিয়েছিলেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত 'কল্লোল যুগের' এ পর্যায়ে নজরুল সম্বন্ধে যা বলেছেন আমি তার ভাব বিশ্লেষণটুকু করছি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত একজন মহৎ শিল্পীর মতো নজরুলকে ঘিরে ছবি এঁকেছেন। ছবিতে তাঁর সময়ের অনেকেই নজরুলকে যেভাবে মূল্যায়ন করেছেন তা তুলনাহীনতো বটেই, সর্বোপরি একজন কবি বিদ্রোহীর জীবনদর্শনকেই মানবিক মানদণ্ডে চিরায়ত করে তুলেছেন তাঁরা। এ তাঁর জীবনের বড় স্বীকৃতি।

কী ভাবে অচিন্ত্য নজরুলকে খুঁজে পেলেন? সে কথা তিনি নজরুল-বন্ধু শৈলজানন্দের মুখ দিয়েই বলিয়ে নিয়েছেন। শৈলজানন্দ ও নজরুলকে নিয়ে এ গ্রন্থের প্রথমেই আমি সে সম্বন্ধে লিখেছি কিন্তু এখানে নজরুল- বন্ধু শৈলজানন্দ পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত সরকার অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত প্রমুখ নজরুল প্রতিভাকে এক বিস্ময়কর রূপ দিতে সক্ষম হয়েছেন।

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর গ্রন্থে শৈলজানন্দকেও অপরূপভাবে তুলে ধরেছেন। রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্রের লেখার ঢঙ, ভাব, ভাষা পাল্টিয়ে দিয়ে নূতন এক চেতনার আকাশ সৃষ্টি করে তোলা যে কম বিস্ময়কর নয়–শৈলজানন্দের 'কয়লাকুঠি' উপন্যাসে তার প্রমাণ রয়েছে প্রতি পাতায়। ইতোমধ্যে শৈলজানন্দ 'কল্লোলে'র একজন হয়ে উঠেছেন। 'কল্লোল পত্রিকা'র প্রথম সংখ্যার প্রথম গল্প 'মা' সে সময়ের এক অসাধারণ গল্প; গোর্কী কিংবা পার্লবাকের 'মা' কেও বুঝি তা হার মানিয়ে দেয়। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত ছোট ছোট প্রশ্নের মাধ্যমে শৈলজানন্দের অনেক কিছুই জেনে নিলেন। এক পর্যায়ে অচিন্ত্য নজরুল সম্বন্ধে জানতে চাইলেন। বললেন, "নজরুলের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক কি? ওকে কি করে চিনলে?

'বা রে ও যে আমার ছেলেবেলার বন্ধু। আর সবাই আমাকের শৈলজা বলে ও ডাকবে শৈল বলে। পাশাপাশি দুই ইস্কুলে একই ক্লাসে পড়েছি আমরা। আমি রাণীগঞ্জে, নজরুল শিয়াড়শোল রাজার ইস্কুলে। মাইল দুয়েকের ছাড়াছাড়ি। থার্ড ক্লাসে এসে মিললাম দু'জনে। আমি হিন্দু ও মুসলমান, আমি লিখি কবিতা–আশ্চর্য হচ্ছ–ও লেখে

গল্প। তবু মিললাম দু'জনে। সেই টানে ধর্মাধর্ম নেই, বর্নাবর্ণ নেই–সৃষ্টির টান, সাহিত্যের টান।"

এরপর অনেক কথা। অচিন্ত্য তাঁর গ্রন্থে সে সবের উল্লেখ করেছেন। এর মধ্যে নজরুলের আর একজন বন্ধু অচিন্ত্যকুমার সহ তাঁদের সব বন্ধুকে জানিয়ে দিলেন নজরুলের বড় ছেলের 'আকিকায়' সকলের নেমনতন্ন। যেতে হবে হুগলীতে। যুক্ত হল আর একজন নৃপেন। আগেই তাঁর কথা বলেছি। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত সেদিনের সেই অভিযানের কথা চমৎকারভাবে বলেছেন তাঁর গ্রন্থে, সে সব আজ ইতিহাস।

অচিন্ত্য লিখেছেনঃ 'মুরলীদা, শৈলজা, প্রেমেন আর আমি চারজন ভবানীপুর থেকে এক দলে আর অন্যদলে ডি আর, গোকুল, নৃপেন, ভুপতি, পবিত্র, সুকুমার–– সকলে সদলবলে হুগলিতে এসে বিস্মিত হলাম। প্লাটফর্মে স্বয়ং নজরুল। 'দে গরুর গা ধুইয়ে' অভিনন্দনের ধ্বনি উঠল। পূর্ব পরিচয়ের নজির এনে ব্যবধানটা কমাবার চেষ্টা করা যায় কিনা সে কথা ভেবে নেবার আগেই নজরুল সবল আলিঙ্গনে বুকে টেনে নিলে–শুধু আমাকে নয়, জনে জনে প্রত্যেককে।

তোমরা হেঁটে হেঁটে একটু একটু করে কাছে আস আর আমি লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে জাপটে ধরি–সাঁতার জানা থাকতে সাঁকোর কি দরকার।" সে দিনের দলে অচিন্ত্যের একনিষ্ঠ বন্ধু প্রেমেন্দ্র মিত্র ছিলেন যাঁর কবিতা সে দিন তরুণদের মন কেড়ে নিচ্ছিল।

নজরুলের হুগলীর বাড়ীতে যেন মহোৎসব। দিনের বেলায় গান বাজনা, হৈ হল্লা, রাতে ভুরিভোজ। ফিরতি ট্রেন কখন তারপর? 'দে গরুর গা ধুইয়ে' ফিরতি ট্রেনের কথা ফিরতি ট্রেনকে জিজ্ঞেস করো।' এইতো নজরুল। বন্ধু প্রিয় একজন মানুষ। তাঁর চরিত্রের এই ঔদার্য সেদিনের সবাইকে মুগ্ধ করেছিল।

অচিন্ত্য লিখেছেন ঃ 'আসলে সে যুগটা ছিল বন্ধুতার যুগ, কমরেডশিপ বা সমমর্মিতার যুগ। যে যখন যার কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, আত্মার আত্মজনের মতো দাঁড়িয়েছে। জিজ্ঞাসা নেই, পরীক্ষা নেই, ব্যবধান নেই। সুজন-সমুদ্রের উর্মিল উত্তালতায় এক ঢেউয়ের গায়ে আরেক ঢেউ–ঢেউ-এর পরে ঢেউ। সব এক জলের কলোচ্ছ্বাস। বাঁধভাঙ্গা এক বন্যার বল।

কল্লোল যুগের আরেক লক্ষণ এই সুন্দর সৌহার্দ, নিকট নিবিড় আত্মীয়তা। একজনের জন্য আরেকজনের মনের টান। একজনের ডাকে আরেকজনের প্রতিধ্বনি। এক সহমর্মিতা।" (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত। পৃ. ৩৪-৩৫)

এই বন্ধুত্বের নায়ক ছিলেন নজরুল। কল্লোলের কত আড্ডায় তিনি সকলকে মাতিয়েছেন। এমনভাবে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে কেউ কখনও পারে নি। নজরুল সেদিন ছিলেন সকলের, গোটা বাংলাদেশের। কবিতা তখন জনারণ্যে গণবাণী। এমন করে সে যুগে আর কেউ লিখতে পারে নি।

অচিন্ত্য আবার বললেনঃ "নজরুল বিষের বাঁশি বাজাচ্ছে, আর সে-সব সে-কথা সবাইকার রক্তে বিদ্রোহের দাহ সঞ্চার করছে। গলার শির জোকের মত ফুলে উঠেছে, ঝাকড়া-চুলো মাথা দোলাচ্ছে অনবরত, আর কখনো কখনো চড়ার কাছে গিয়ে গলা চিরে যাচ্ছে দু-তিন ভাগ হয়ে–সব মিলে হয়তো একটা অশালীন কর্কশতা–কিন্তু সব কিছু অতিক্রম করে সেই উন্মাদনার মাধুর্য–ইহসংসারে কোথাও তার তুলনা নেই। প্রখরতার মধ্যে সে যে কি প্রবলতা, কার সাধ্য তা প্রতিরোধ করে। কার সাধ্য সে অগ্নিমন্ত্রে না দীক্ষা নেয় মনে মনে! এতো শুধু গান নয় এ আহ্বান–বন্ধন বর্জনের আর্তনাদ! কার সাধ্য কান পেতে না শোনে! বুক পেতে না গ্রহণ করে!

এই শিকল পরা ছল মোদের এ শিকল পরা ছল।
এই শিকল পরেই শিকল তোদের করব রে বিকল ॥
.....
.....

একবার গান আরম্ভ করলে সহজে থামতে চায় না নজরুল। আর কার এমন ভাবের অভাব হয়েছে যে নজরুলকে নিবৃত্ত করে। হারমোনিয়মের রিডের উপর দিয়ে খটাখট খটাখট করে ক্ষিপ্তবেগে আঙ্গুল চালায় আর দীপ্তস্বরে গলা ধরে।

মোরা ভাই বাউল চারণ মানিনা শাসন বারণ
জীবন মরণ মোদের অনুচর রে।
দেখে ঐ ভয়ের ফাঁসি হাসি জোর জয়ের হাসি
অবিনাশী নাইক মোদের ডর রে ॥
.....
.....

অচিন্ত্য লিখেছেন ঃ 'জীবনে এমন কয়টা দিন আছে যা স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকে স্মৃতিতে––অক্ষরও মুছে যায় ক্রমে ক্রমে কিন্তু সেই স্বর্ণচ্ছটা জেগে থাকে আমরণ। তেমনি সোনার আলোয় আলো করা দিন এ। রেখা মুছে গেছে কিন্তু ধুপটি আছে অবিনশ্বর হয়ে। দুপুরে গঙ্গায় স্নান, বিকালে গঙ্গায় নৌকা ভ্রমণ, রাত্রে আহার––এ একটা অমৃতময় অভিজ্ঞতা। বায়ু, জল, তরু, লতা, তারা, আকাশ সব মধুমান হয়ে উঠেছে–মৃত্যুজিৎ যৌবনের আস্বাদনে। সৃষ্টির উল্লাসে বলীয়ান হয়ে উঠেছে দুর্বার কল্পনা।

সেই রাত্রে আর গান নেই, শুরু হল কবিতা। প্রেমেন একটা কবিতা আবৃত্তি করলে–বোধ হয়, "কবি নাস্তিক"। 'বুকে দিলে যে, ভুখ দিলে যে, দুখ দিতে সে ভুললনা, মৃত্যু দিলে লেলিয়ে পিছে পিছে।"

আমিও অনুসরণ করলাম। "দে গরুর গা ধুইয়ে।" এরা আবার কবিতাও লেখে নাকি? সবাই অভিনন্দন করে উঠল এই প্রথম ও অত্যাশ্চর্য আবিষ্কারে। বলো আরো বলো–আরো যটা মুখস্ত আছে।

ফিরতি ট্রেন কখন চলে গিয়েছে। নেমে এসেছে ক্লান্তিহরণ স্তব্ধতা। কিন্তু নৃপেন কাউকে ঘুমুতে দেবেনা। যেন একটা ঘর ছাড়া অনিয়মের জগতে চলে এসেছি সবাই। দেখলাম বাড়ি ফিরে না গেলেও চলে, দিব্বি না ঘুমিয়ে আড্ডা দেওয়া যায় সারা রাত। প্রতিবেশি হৃদয়ের উত্তাপের পরিমণ্ডলে এসে নবীন সৃষ্টির প্রেরণা লাভ করা যায়, কেননা আমরা জেনে নিয়েছি, আমরা সব এক প্রাণে প্রেরিত। এক ভবিষ্যতের দিশারী।" (অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়, প্রাগুক্ত. পৃ. ৩৬)

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায়ের উপরোক্ত বিবরণ হুগলিতে নজরুলের বাসভবনের মিলন মেলায়। এ বিবরণ থেকে অত্যন্ত স্পষ্ট হয়ে ফুঠে উঠেছে নজরুলের প্রতি সকল কবিদের দুর্বার আকর্ষণ। 'কল্লোলের' অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দীনেশরঞ্জন দাশগুপ্ত। সংক্ষেপে তাঁকে বলা হতো ডি. আর। নজরুল তাঁর বিষের বাঁশীর ভূমিকায় দীনেশরঞ্জনকে 'আমার ঝড়ের রাতের বন্ধু' বলে উল্লেখ করেছিলেন।

এই 'বিষের বাঁশী' শেষ পর্যন্ত নিষিদ্ধ করেছিল বৃটিশ সরকার। কল্লোল অফিসও খানা তল্লাসী হয়েছে। এ সময় কবি সাহিত্যিকদের মনে আতঙ্ক জাগলেও নজরুল ছিলেন অকুতোভয়। তাঁর 'বিষের বাঁশী' ও 'ভাঙার গান' এই দুইটি বই নিষিদ্ধ হয়েছিল ১৯২৪ সালে। এ দুটি বইই ফৌজদারী বিধির ৯৯-এ ধারা অনুসারে নিষিদ্ধ হয়। 'বিশের বাঁশি'র প্রকাশক ছিল নজরুল ইসলাম নিজে।

অচিন্ত্যকুমার সেন বলেছেনঃ এই বিষের বাঁশির বিষ জুগিয়েছেন আমার নিপীড়িতা দেশমাতা আর আমার উপর বিধাতার সকল রকম আঘাতের অত্যাচার।

নজরুল 'বিষের বাঁশি' উৎসর্গ করেছিলেন মিসেস এম. রহমানকে। তাঁকে তিনি বাংলার অগ্নিনাগিনী মেয়ে বলেছেন

তোমার মমতা-মাণিক আলোকে চিনিনু তোমারে মাতা
তুমি লাঞ্ছিতা বিশ্বজননী! তোমার আচল পাতা
নিখিল দুঃখী নিপীড়িত তরে, বিষ শুধু তোমা দহে
ফণা তব মাগে পীড়িত নিখিল ধরণীর ভার বহে"

'প্রবাসী' পত্রিকা বিষের বাঁশি সম্বন্ধে উল্লেখ করেছেঃ "কবিতাগুলি যেন আগ্নেয়গিরি, প্লাবন ও ঝড়ে প্রচণ্ড রুদ্ররূপ ধরিয়া বিদ্রোহী কবির মর্মজ্বালা প্রকটিত করিয়াছে। জাতির এই দুর্দিনে মুমূর্ষু নিপাড়িত দেশবাসীকে মৃত্যুঞ্জয়ী নবীন চেতনায় উদ্বুদ্ধ করিবে।'

নজরুল তাঁর সমকালে তাঁর রচনার জন্য এতই সমাদৃত হয়েছিলেন যে শনিবারের চিঠির সজনীকান্ত দাস তাঁর সে প্রতিভাবে স্বীকার করতে বাধ্য হন। 'বিষের বাঁশী'

নিষিদ্ধ হলে সজনীকান্ত দাস লিখলেন ঃ 'স্বদেশী আন্দোলনের মুখে রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ কবিগণ যে ভাবে বহুবিধ সঙ্গীত ও কবিতার সাহায্যে বাঙালীর দেশপ্রেম উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, অসহযোগ আন্দোলনের বৃহত্তর বিপ্লবে যে কারণেরই হউক, তাঁহারা ঠিক সে ভাবে সাড়া দেন নাই। একমাত্র কবি নজরুলই ছন্দ গানে এই আন্দোলনকে জয়যুক্ত করিয়াছিলেন; পরবর্তী আন্দোলনের চারণ কবি তাঁহাকেই বলা যাইতে পারে।

'কবি নজরুল ইসলামের 'বিষের বাঁশী' এই থর থর প্রাণস্পন্দন যুগের গান। ইহার আঘাত সরকার সহ্য করিতে পারেন নাই বলিয়া দীর্ঘকাল ইহার প্রচার রদ করা হইয়াছিল। জাতীয় জাগরণের সহায়ক হিসাবে এই গ্রন্থের প্রচার ও প্রসার একান্ত আবশ্যক।' (শিশির কর, নিষিদ্ধ নজরুল, পৃ. ১৩)

নজরুল তাঁর লেখনীর মাধ্যমেই সে দিন একটি ঘুমন্ত জাতিকে জাগ্রত করেছিলেন। 'কল্লোল যুগ' এ কথার প্রতিধ্বনি করেছে নানা ভাবে। 'কল্লোল পত্রিকা'র অফিসে পুলিশের হানা সম্পর্কে গোকুল চন্দ্র নাগ অচিন্ত্যকুমারকে লেখেনঃ "হঠাৎ কেন জানি পুলিশের কৃপাদৃষ্টি আমাদের উপর পড়েছে, আমাদের আপিস দোকান সব খানা-তল্লাস হয়ে গেছে, আমরা সবাই এখন কতকটা নজরবন্দী– 1818 Act 3' তে.....।'

অচিন্ত্য লিখলেনঃ 'নজরুলের বিষের বাঁশী'র জন্যই পুলিশ হানা দিয়েছিল। মনে করেছিল সবাই এরা রাজনৈতিক সন্ত্রাসবাদী। ভাবনৈতিক সন্ত্রাসবাদীদের দিকে তখনো চোখ পড়েনি।....

পবিত্র লিখলেন ঃ 'কাজীর 'বিষের বাঁশী' নিষিদ্ধ হয়েছে। কল্লোলের আপিস ও দোকান খানাতল্লাসী হয়েছে। সকলের মধ্যে একটা প্রচণ্ড আশঙ্কাভীতি এসে গেছে। সিআইডি-র উপদ্রবও সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড রকম বেড়ে গেছে। কলকাতা শহরটাই তোলপাড় হয়ে গেছে। যেখানেই যাও চাপা-গলায় এই আলোচনা। যারা ভুলেও কখনও রাজনীতির চিন্তা মনে আনে নাই তাঁদের মধ্যেও একটা সাড়া পড়ে গেছে–"

অচিন্ত্য লিখলেনঃ "সেই সাড়াটা 'কল্লোলের' লেখকদের মধ্যেও এসে গেল। চিন্তায় ও প্রকাশে এল এক নতুন বিরুদ্ধবাদ। নতুন দ্রোহবাণী। সত্যভাষণের তীব্র প্রয়োজন ছিল যেমন রাজনীতির ক্ষেত্রে তেমনি ছিল অচল প্রতিষ্ঠ স্থবির সমাজের বিপক্ষে।" (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত. প্রাগুক্ত পৃ. ৪৬)

সুতরাং স্পষ্ট বোঝা যায় নজরুল তাঁর সাহিত্য দিয়ে যে পরিবর্তনের ঝড় তুলেছিলেন, 'কল্লোলের' গায়ে তা তীব্র হয়ে প্রকাশ পেয়েছিল। বাংলা সাহিত্যে নজরুল এই জাগরণমন্ত্রে চিরঞ্জীব হয়ে থাকবেন।

রবীন্দ্রনাথ থেকে বেরিয়ে আসার ডাকও দিয়েছিলেন নজরুল। অচিন্ত্য লিখলেনঃ 'রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে এসেছিল কল্লোল"। সরে এসেছিল অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতায়। নিঃগত মধ্যবিত্তদের সংসারে কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।

প্রমথ চৌধুরী প্রথম এই সরে আসার মানুষ। বিষয়ের দিক থেকে না হোক মনোভঙ্গি ও প্রকাশভঙ্গির দিক থেকে। আর দ্বিতীয় মানুষ নজরুল। যেমন লেখায় তেমনি পোষাকে–আষাকেও ছিল একটা রঙিন উচ্ছৃঙ্খলতা।

মনে আছে, অভিনবত্বের অঙ্গীকারে আমাদের কেউ-কেউ তখন কোঁচা না ঝুলিয়ে কোমরে বাঁধ দিয়ে কাপড় পড়তাম–পাড়হীন থান ধুতি–আর পোশাকের পুরাতন দারিদ্র্য প্রকট হয়ে থাকলেও বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হতাম না। নৃপেন তো মাঝে মাঝে আলোয়ান পরেই চলে আসত। বস্তুত, পোশাকের দীনতাটা উদ্ধতারই উদাহরণ বলে ধরে নিয়েছিলাম। কিন্তু নজরুলের ঔদ্ধত্যের মাঝে একটা সমারোহ ছিল, যেন বিহ্বল, বর্ণাঢ্য কবিতা। গায়ে হলুদ পাঞ্জাবি, কাঁধে গেরুয়া উড়ুনি। কিংবা পাঞ্জাবি গেরুয়া উড়ুনি হলদে। বলত, আমার সম্ভ্রান্ত হবার দরকার নেই, আমার বিভ্রান্ত হবার কথা। জমকালো পোশাক না পরলে ভিড়ের মধ্যে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করব কি করে?

মিথ্যে কথা। পোশাকের প্রগলভতার দরকার ছিল না নজরুলের। বিস্তীর্ণ জনতার মাঝেও সহজে চিহ্নিত হত সে, এত প্রচুর তার প্রাণ, এত রোধবন্ধনহীন তার চাঞ্চল্য। সব সময়ে উচ্চরোলে হাসছে, ফেটে পড়ছে উৎসাহের উচ্ছলতায়। বড় বড় টানা চোখ, মুখে সরল পৌরুষের সঙ্গে শীতল কমনীয়তা। দূরে থাকলেও মনে করিয়া দেবে অন্তরের চিরন্তন মানষ বলে। রঙ শুধু পোষাকে কি, রঙ তার কথায় তার হাসিতে তার গানের অজস্রতায়।.....

এই অস্থির এলোমেলোমি নজরুলের শুধু পোষাকে–আষাকে নয়, তার লেখায়, তার সমস্ত জীবন যাপনে ছড়িয়ে ছিল। বন্যার তোড়ের মত সে লিখত, চেয়েও দেখত না সেই বেগ প্রাবল্যে কোথায় সে ভেসে চলেছে। যা মুখে আসত তাই যেমন বলা তেমনি যা কলমে আসত তাই সে নির্বিবাদে লিখে যেত। স্বাভাবিক অসহিষ্ণুতার জন্য বিচার করে দেখতনা বর্জন-মার্জনের দরকার আছে কিনা। পুনর্বিবেচনায় সে অভ্যস্ত নয়। যা বেরিয়ে এসেছে তাই নজরুল, 'কুবলাখান' এ যেমন কোলরিজ। নিজের মুখে কারণে–অকারণে সে ৱো ঘষত খুব, কিন্তু কবিতার এতটুকু প্রসাদন করতে চাইত না। বলত, অনেক ফুলের মধ্যে থাকনা কিছু কাঁটা, কন্টকিত পুষ্পইতো নজরুল ইসলাম।

কিন্তু মোহিতলাল তা মানতে চাইতেন না। নজরুলের গুরু ছিলেন এই মোহিতলাল। গজেন ঘোষের বিখ্যাত আড্ডা থেকে কুড়িয়ে পান নজরুলকে। দেখেন উদ্বেলতা যেমন আছে আবিলতাও কম নয়। স্রোতশক্তিকে ফলদায়ী করতে হলে তীরের বন্ধন আনতে হবে। আনতে হবে সৌন্দর্য আর সংযম, জাগ্রত বুদ্ধির বশে আনতে হবে, আনতে হবে ভাবের উদ্দামতাকে। এই বুদ্ধির দীপায়নের জন্য চাই কিছু পড়াশোনা–অনুভূতির সঙ্গে আলোচনার আগ্রহ। নিজের পরিবেষ্টনের সাথে নিয়ে এলেন নজরুলকে। বললেন, পড়ো শেলি-কীট্স, পড়ো বায়রণ আর ব্রাউনিং। দেখ কে কি লিখেছে, কিভাবে লিখেছে, মনে স্থৈর্য আনো, হও নিজের সমালোচক, কল্পনার সোনার

সঙ্গে চিন্তার সোহাগ মেশাও। "দে গরুর গা ধুইয়ে–" নজরুল থোড়াইকেয়ার করে 'লেখাপড়া'। মনের আনন্দে লিখে যাবে সে অনর্গল, পড়বার বা বিচার করবার তার সময় কই। খেয়ালী সৃষ্টিকর্তা মনের আনন্দে তৈরি করে ছেড়ে দিয়েছে গ্রহ–নক্ষত্রকে, পড়ুয়া জ্যোতিষীরা তার পর্যালোচনা করুক। সে-ও সৃষ্টিকর্তা।' (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৭-৪৯)

কি অসাধারণ মূল্যায়ণ। নজরুলের কাব্যে যারা খাদ দেখে আঁতকে ওঠেন সমগ্রকে বিচার না করেই, তাঁদের প্রতি এই লেখা একটা চপটাঘাত। সোনাতে খাদ থাকতেই হবে, তা নইলে অলঙ্কার হবে না। নজরুলের শিল্পকর্ম একান্তই নজরুলের। তিনি সাধারণ নন, তিনি অসাধারণ। অচিন্ত্য তা বুঝেছিলেন এবং তাইতো 'কল্লোল যুগের' এই ব্যতিক্রমী মানুষটাকে নির্দ্বিধায় বাংলা সাহিত্যের মণিকোঠায় বসিয়েছেন।

'কল্লোলযুগে' অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায় কবি-সাহিত্যিকদের নানা স্থানের আড্ডার বিষয়টিও নিয়ে এসেছেন এমনিভাবে। "এক–একদিন এসে পড়ত নজরুল। ভাঙা হারমোনিয়ম একটা জুটত এসে কোত্থেকে, চারদিক সরগরম হয়ে উঠত। ওর প্রথম কীর্তন 'কেন প্রাণ ওঠে কাঁদিয়া' এই বারবেলা ক্লাবেই প্রথম শুনিয়ে গেছে। কোন এক পথের নাচুনী ভিক্ষুক মেয়ের থেকে শিখে নিয়েছিল সুর, তারই থেকে রচনা করলে–"রুমঝুম, রুমঝুমঝুম কে এল নূপুর পায়" আর তা শোনাবার জন্য সটান চলে এল রাস্তার প্রথম আস্তানা শশাঙ্কর আখড়াতে।"

এত জনসমাগম, তবু যেন 'কল্লোলের' মত জমত না। জনতার জন্যই জমতনা, জনতা ছিল, কিন্তু ঘনতা ছিলনা। আকস্মিক হুল্লোড় ছিল খুব, কিন্তু কল্লোলের সেই আকস্মিক স্তব্ধতা ছিল না। যেন এক পরিবারের লোক এক নৌকায় যাচ্ছিল না, ছত্রিশ জাতের লোক ছত্রভঙ্গ হয়ে চলেছি এক জাহাজে, উত্তেজ-উদ্বেল জল ঠেলে।

তবু নজরুল নজরুল। এসে গান ধরলেই হল, সব এক অলক্ষ সুরে বাঁধা পড়ে যেতাম। যৌবনের আনন্দে প্রত্যেক হৃদয়ে বন্ধুতার স্পন্দন লাগত, যেন এক বৃক্ষে পল্লব–পরম্পরায় বসন্তের শিহরণ লেগেছে। একবার এক দোল-পূর্ণিমায় শ্রীরামপুরে গিয়েছিলাম আমরা অনেকে। বোটানিক্যাল গার্ডেন্স্ পর্যন্ত নৌকো নিয়েছিলাম। নির্মেঘ আকাশে পর্যাপ্ত চন্দ্র সেই জ্যোৎস্না সত্যি-সত্যিই অমৃত তরঙ্গিনী ছিল। গঙ্গাবক্ষে সে রাত্রিতে সে নৌকায় নজরুল অনেক গান গেয়েছিল–গজল, ভাটিয়ালী, কীর্তন। তারমধ্যে 'আজি দোল-পূর্ণিমাতে দুলবি তোরা আয়" গানখানির সুর আজও স্মৃতিতে মধুর হয়ে আছে। সেই অনির্বচনীয় পরিপার্শ্ব, সেই অবিস্মরণীয় বন্ধু সমাগম জীবনে বোধ হয় আর দ্বিতীয়বার ঘটবে না।" (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত পৃ. ১৭৪)

কল্লোল যুগের সঙ্গে সজনীকান্ত দাস ও 'শনিবারের চিঠি' সম্পর্ক প্রথম দিকে তিক্ত হলেও ক্রমান্বয়ে তারও পালাবদল হয়েছিল এবং তা সম্ভব হয়েছিল নজরুলের জন্যেই।

অচিন্ত্যকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর গ্রন্থের একেবারে শেষে এসে লিখলেনঃ ".....সুবাতাস বইতে লাগল আস্তে আস্তে। কটুক্তি ছেড়ে সদুক্তির চেষ্টা-চর্চা শুরু করল শনিবারের চিঠি।.....আসলে রোষ অস্ত গেলেই রস এসে দেখা দেয়। 'শনিবারের চিঠি'ত ক্রমে ক্রমে রোষের জগৎ থেকে চলে আসতে লাগল রসের জগতে। "পতন অব্যুদয় দুর্গম–পন্থা শেষ পর্যন্ত" পতন অভ্যুদয়–বন্ধুর পন্থা বলেই মান পেল। "খোকা–ভগবান" তাক্‌মান পেল মহাপুরুষ প্রবর নেতাজী রূপে। বিদ্রোহী নজরুল ইসলাম পেল উপযুক্ত স্বদেশ-প্রেমীর বিজ্ঞাপন।" (অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত, প্রাগুক্ত পৃ. ১৮৮)

কল্লোল যুগের অন্যতম নৈয়ায়িক বলে কিনা জানিনা 'শনিবারের চিঠি'র সজনীকান্ত দাস পরিশেষে নজরুলকে যোগ্য সম্মানে ভূষিত করেছেন। অবশ্য এই মনোভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে তখনই যখন নজরুলের 'বিষের বাঁশী' নিষিদ্ধ হয়েছে। সজনীকান্ত দাস নজরুল প্রতিভাকে সম্যকভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে যে 'কল্লোল পত্রিকা'র পাশাপাশি 'কালি–কলম', 'প্রগতি' এবং 'ধপছায়া' ইত্যাদি পত্রিকায় নজরুল মাঝেমধ্যে লিখেছেন। এসব পত্রিকায় যারা লিখতেন তাঁরা নিজেকে আধুনিক এবং প্রগতিবাদী বলে চিহ্নিত হতে চাইতেন। নজরুলও প্রগতিবাদী ছিলেন। শুধু তাই নয়, আধুনিক কবিতার পথযাত্রা তাঁর নেতৃত্বেই শুরু হয়েছিল। যা হোক, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে নজরুল তাঁর কবিতায় যুগের দাবীকে প্রাধান্য দিলেও তিনি শুধুমাত্র 'যুগের কবি' হয়ে থাকেন নি। তিনি যুগকে অতিক্রম করে মহাযুগের কবি হিসেবেই গণ্য হয়েছেন। 'কল্লোল যুগ' তাঁকে 'মহামানব' ভূষণে ভূষিত করেনি ঠিকই। তবে একজন যথার্থ মানুষের কবি হিসেবেই তাঁকে বরণ করে নিয়েছে।